**৯ থেকে ৩০ অক্টোবর ২২ দিন মা-ইলিশ ধরা নিষিদ্ধ**

শাহ আলম বাদশা

 বাংলাদেশের কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে মৎস্যখাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের মোট জনগোষ্ঠীর ১১ শতাংশের অধিক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এখাতে নিয়োজিত থেকে জীবিকানির্বাহ করছে। মৎস্যোৎপাদনে বাংলাদেশের সাফল্য আজ বিশ্বপরিমণ্ডলেও স্বীকৃত। স্বাধীনতার ৪৬ বছর পর ২০১৭ সালে বাংলাদেশ মৎস্যোৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। দেশের মোট জিডিপি’র ৩.৫৭ শতাংশ এবং কৃষিজ জিডিপি’র একচতুর্থাংশের বেশি এখন মৎস্যখাতের অবদান।

 এখন আমরা ইলিশ উৎপাদনে বিশ্বে ১ম, অভ্যন্তরীণ মুক্তজলাশয়ের মৎস্যোৎপাদনে ৩য়, মিঠাপানির মৎস্যোৎপাদনে ৪র্থ, চাষকৃত মৎস্যোৎপাদনে ৫ম এবং তেলাপিয়া উৎপাদনেও ৪র্থ অবস্থান অর্জন করে গৌরবার্জন করেছি, যা বর্তমান সরকারে সময় মৎস্যোন্নয়নে গৃহীত সময়োপযোগী কার্যক্রমের প্রতিফলন।

 ২০১৭-১৮ সালে দেশে মাছের চাহিদা ৪২ লক্ষ ৩৮ হাজার মেট্রিক টন নির্ধারিত হলেও মোট উৎপাদন হয়েছে ৪২ লক্ষ ৭৭ হাজার মেট্রিক টন। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন নদ-নদী ও অভ্যন্তরীণ মুক্তজলাশয়ে সুফলভোগীদের ব্যবস্থাপনায় ৪৩২টি অভয়াশ্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০১৮-১৯ সালে বিভিন্ন উন্নয়নপ্রকল্প এবং রাজস্বখাতের আওতায় মোট ২৮৮ মে.টন পোনামাছ অবমুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া ২০১৮-১৯ সালে ৪টি উন্নয়নপ্রকল্পের মাধ্যমে জলাশয় পুনঃখনন কার্যক্রম চলমান থাকায় বিগত ফেব্রুয়ারি-২০১৯ পর্যন্ত ২৮ লক্ষ ঘন মিটার পুকুর খনন করা হয়েছে। এ সকল জলাশয় উন্নয়নের ফলে দেশে গড়ে বার্ষিক প্রায় তিনহাজার মে.টন অতিরিক্ত মাছ উৎপাদিত হচ্ছে।

 বিশ্বে সমাদৃত ইলিশেও দেশে বিপ্লব ঘটে গেছে। বাংলাদেশের মোট উৎপাদিত মাছের প্রায় ১২ শতাংশ আসে শুধু ইলিশ থেকে। দেশের জিডিপি’তে ইলিশের অবদান একশতাংশের অধিক। কাজেই একক প্রজাতি হিসেবে ইলিশের অবদান সর্বোচ্চ। সমাজবান্ধব কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ২০১৬-১৭ সালে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ৪.৯৬ লক্ষ মে.টনে উন্নীত হয়েছিল, যার বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় ১৮,০০০ কোটি টাকা। নানামুখী সমন্বিত কার্যক্রমগ্রহণের ফলে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রায় ৫ লক্ষ ১৭ হাজার মেট্রিক টন ইলিশ উৎপাদিত হয়েছে, যা বিগত ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ছিল মাত্র ২ লক্ষ ৯৯ হাজার মেট্রিক টন। অর্থাৎ মাত্র ৯ বছরের ব্যবধানে এ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৬৬ শতাংশ।

 ইলিশ-ব্যবস্থাপনায় সরকারের এই সাফল্য অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মৎস্যোৎপাদনবৃদ্ধিতে বিশ্বে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এমনকি বাংলাদেশের জাতীয় মাছ ইলিশ এর ভৌগোলিক নিবন্ধন সম্পন্নের ফলে পণ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও গুণগত মানসম্পন্ন ইলিশ মার্কেটিংয়ে শীঘ্রই দেশবিদেশে বাণিজ্যিক ও অন্যান্য সুবিধা পাওয়া যাবে। ভৌগলিক স্বীকৃতির মাধ্যমে জিআই (GI) সনদপ্রাপ্তিতে নিজস্ব পরিচইয়েই এখন বিশ্ববাজারে হাজির হয়েছে ইলিশ। ইতোপূর্বে ইলিশের কোনো ব্র্যান্ডিং এবং ট্রেডমার্ক ছিল না। বিশ্বে ইলিশের ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশে প্রথম সম্পন্ন হবার ফলে বিদেশের ক্রেতারা এখন সহজেই বাংলাদেশের সুস্বাদু ইলিশ শনাক্ত করতে পারবে।

 আজ ইলিশমাছ আমাদের জাতীয় অর্থনীতি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রাণিজ আমিষের যোগান এবং দারিদ্র্যবিমোচনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ইলিশসম্পদ রক্ষা এবং এর ক্রমবর্ধমান উন্নয়নে সরকার নানামুখী সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করছে, যার ফলে ইলিশের উৎপাদন আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে সাধারণ জনগণের নাগালে চলে এসেছে। দেশের প্রায় সকল নদীতেই এখন ইলিশ পাওয়া যাচ্ছে। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের মজুদ ও জীববৈচিত্র্যকে আরও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে ২০১৯ সালের ২৬ জুন নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলাধীন নিঝুমদ্বীপসংলগ্ন ৩ হাজার ১ শত ৮৮ বর্গকিলোমিটার সমুদ্র এলাকায় দেশের প্রথম সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা অর্থাৎ এমপিএ (MPA) ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে ইলিশের প্রজননক্ষেত্র, বিচরণক্ষেত্র ও মাইগ্রেশনপথ যেমন সুরক্ষিত হচ্ছে, তেমনই অনেক বিপন্ন প্রজাতির মাছের গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থলও নিরাপদ থাকছে। ২০১২ সালে জুলাই হতে ডিসেম্বর মাস পযন্ত ৬ মাসে মাছ-আহরণের পরিমাণ ছিল ২৮ হাজার ২ শত ৮০ মেট্টিক টন। অথচ বন্ধমৌসুম আরোপের পর ২০১৮ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৪৭ হাজার ৫ শত ৭২ মেট্টিক টনে উন্নীত হয়েছে।

 ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো-প্রতিবছরের নভেম্বর হতে জুন পর্যন্ত ৮ মাস জাটকা ধরা বন্ধ রাখা, ইলিশের প্রজনন মৌসুমে ২২ দিন মা-ইলিশ আহরণ বন্ধ রাখা, প্রতিবছর জাতীয় মৎস্যসপ্তাহ পালন, অভয়াশ্রম স্থাপন, জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং মোবাইলকোর্টসহ বিভিন্ন অভিযান পরিচালনা করা। ইলিশ সম্পদের ধারাবাহিক উন্নয়নে বিদ্যমান ৬টি ইলিশ-অভয়াশ্রম স্থাপনের ফলে ইলিশের পাশাপাশি নদীর অন্যান্য মাছের প্রাচুর্যতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া বঙ্গোপসাগরের বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ মাছের উৎপাদন ও বিলুপ্তপ্রায় মাছের মজুদবৃদ্ধি এবং ইলিশসহ বিভিন্ন মাছের নিরাপদে ডিম পাড়া নিশ্চিতের জন্য ২০১৫ সাল থেকে প্রতিবৎসর ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত মোট ৬৫ দিন সমুদ্র ও উপকূলীয় জলায়তনে সকল যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক নৌযান দ্বারা মৎস্য-আহরণ নিষিদ্ধ করার পদক্ষেপ জোরদার করা হয়েছে। সরকার ৬৫ দিন মাছধরার বিরুদ্ধে চলতি বছরই প্রথম কঠোর অবস্থানে যাওয়ায় ইলিশসহ সমুদ্রের অন্যান্য মাছের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। বন্ধমৌসুম (Ban Period) আরোপের কারণে বঙ্গোপসাগরে ২০১৫ সালের আগের বছর গুলোর তুলনায় পরের বছর গুলোতে সামুদ্রিক মাছ-আহরণ উল্লেখ্যযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

-২-

 সমুদ্রে এ সময়ে জেলেদের জীবিকা নির্বাহ করার জন্য ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদান ও বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তা সম্প্রসারিত করা হচ্ছে। সরকার দেশের মৎস্যোৎপাদন বৃদ্ধির সাথেসাথে এখাতের ওপর নির্ভরশীল মৎস্যজীবীদের উন্নয়নে নানা সহায়তা যেমন, জাটকা রক্ষায় ফেব্রুয়ারি হতে মে পর্যন্ত পরিবারপ্রতি মাসিক ৪০ কেজি এবং ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে ২২ দিনের জন্য পরিবারপ্রতি ২০ কেজি করে চাল প্রদান করা হচ্ছে। সমুদ্রে ৬৫ দিন মাছধরা নিষিদ্ধকালীন এ বছরই প্রথম দেশের সমুদ্রোপকূলবর্তী ১২টি জেলার ৪২ টি উপজেলার ৪ লক্ষ ১৭ হাজার ৭৮৪ চুরাশি (৪,১৭,৭৮৪) জেলে পরিবারকে মাসিক ৪০ কেজি হারে বিশেষ ভিজিএফ চাল প্রদান করা হয়েছে, যা অব্যাহত থাকবে। জাটকা নিধনরোধের ৮ মাস, মা-ইলিশ সংরক্ষণের ২২দিন এবং সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন ৬৫ দিনের জন্য জেলেদের খাদ্য সহায়তায় ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে ২২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা রয়েছে বলে জানা গেছে। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনানুযায়ী ইলিশ সম্পদের স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের জন্য দরিদ্র জেলেদের সঞ্চয়ী করে তোলা ও আপদকালীন জীবিকা পরিচালনা এবং বিকল্প কর্মসংস্থানে সহায়ক তহবিল গঠনের জন্য ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার একটি “ইলিশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন তহবিল” গঠন করা হয়েছে।

 ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা-ইলিশের নিধন রোধে ৯ থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত ২২দিন প্রতিবছরের ন্যায় যথারীতি সকল প্রকার মাছধরা বন্ধ থাকবে। এসময় ইলিশের প্রজনন ক্ষেত্রের ৪টি পয়েন্ট দ্বারা পরিবেষ্টিত ৭০০০ বর্গকিলোমিটার উপকূলীয় এলাকার সকল নদনদীতে এ নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে। ৪টি পয়েন্ট হচ্ছে- মীরসরাই ও চট্টগ্রামের মায়ানি, তজুমুদ্দিন ও ভোলার পশ্চিম সৈয়দ আওলিয়া, কুতুবদিয়া ও কক্সবাজারের উত্তর কুতুবদিয়া এবং কলাপাড়া ও পটুয়াখালীর লতা চাপালী পয়েন্ট। আইনানুযায়ী সারাদেশে ইলিশ মাছের আহরণ, পরিবহণ, মজুদ, বাজারজাতকরণ এবং ক্রয়বিক্রয় নিষিদ্ধ থাকবে। উল্লেখ্য, প্রতিবছর আশ্বিন মাসের প্রথম উদিত চাদেঁর পূর্ণিমার আগের ৪দিন, পরের ১৭দিন এবং পূর্ণিমার দিনসহ মোট ২২দিনের এই নিষেধাজ্ঞা ২০১৭ সাল থেকে জারী রয়েছে। তবে এই নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ ২০১১ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত ১১দিন এবং ২০১৫ সালে ছিল ১৫দিন। এ নিষেধাজ্ঞার আইন ভঙ্গ করলে আইনভঙ্গকারীকে কমপক্ষে ১ বছর থেকে ২ বছর সশ্রম কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড দেওয়া যাবে।

 তবে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষণায় ইলিশসহ অন্যান্য মাছের জন্য মারাত্মক ধ্বংসাত্মক তথ্য পাওয়া গেছে। গবেষণায় বাঁকখালী নদীর মোহনায় পানির উপরিভাগে ভাসমান অবস্থায় প্রতি র্বগকলিোমটিারে ২০ হাজাররেও বেশি মাইক্রোপ্লাস্টিক পাওয়া গেছে। মহেশখালী, টেকনাফ ও শাহপরীর দ্বীপ থেকে সংগৃহীত অপরিশোধিত লবণে কেজিতে প্রায় ১০০০টি এবং বাণিজ্যিক পরিশোধিত লবণে প্রতিকেজিতে পাওয়া গেছে ৭০০ থেকে ৯০০টি মাইক্রোপ্লাস্টিক। লাবণী পয়ন্টে সমুদ্রসৈকত ও উখয়িা-রামুর সংযোগস্থল কাঁকড়া বিচেও প্লাস্টিক-দূষণের মাত্রা কক্সবাজার শহরের তুলনায় তিনগুণের বেশি। কাঁকড়া বিচটি নদীর মোহনায় হওয়ায় এ নদীর র্দীঘপথ দিয়ে নেমে আসা বিশাল এলাকার প্লাস্টিকর্বজ্য বঙ্গোপসাগররে সাথে মিলিত হচ্ছে, যা ইলিশসহ সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। কেননা ইলিশের বসবাস হচ্ছে লবণাক্ত ও মিঠাপানির সম্মেলনেই। সমুদ্রে বড়ো হলেও মা-ইলিশ ডিমপাড়ার সময় হলেই স্রোতের বিপরীতে ছুটে যায় মিঠাপানির নদীতে। তাই নদী ও সমুদ্রদূষণ অর্থাৎ প্রাকৃতিক পানির উৎসের এই মারাত্মক দূষণ রোধ করা না গেলে আমাদের মৎস্য সম্পদের জন্য অচিরেই দুর্যোগ নেমে আসবে। কাজেই প্রয়োজন এখন সচেতনতা দেশ ও পরিবেশ রক্ষার মনোভাব। আমরাই পারি আমাদের সম্পদ রক্ষা করতে ও নিজেদের বাঁচাতে।

#

২১.১০.২০১৯ পিআইডি ফিচার